Vol. 32 | No. 1 | 1988

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শক্তিসাধনা ও নজরুলের কবিতা

Volume	32
Issue	1
Year	1988
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	স্বপ্না রায়
Published online	October 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v32i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i1.4
Pages	97-107
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শক্তিসাধনা ও নজরুলের কবিতা

স্বপ্না রায়

সৃষ্টির আদিযুগ থেকেই মানুষ শক্তিসাধনা করে এসেছে। প্রথম পর্যায়ে এ-সাধনা ছিলো তার টিকে থাকার প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। বিবর্তিত পথ-পরিক্রমায় এর ক্রমরূপান্তর সাধিত হয়—নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রয়াস থেকে ক্রমে আত্মবিস্তারের বাসনা প্রাধান্য পায় এবং সে-উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতে থাকে শক্তি-উৎস ও হাতিয়ারসমূহ। প্রত্যাশার বাস্তবায়নে মানুষ স্বীয় শক্তিকে ব্যবহার করেছে নানাবিধ উপায়ে। প্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগ—উভয়বিধ উপায়ে শক্তি প্রয়োগের ফল কখনো শুভ হয়েছে, মানুষের কল্যাণে কাজ করেছে, আবার কখনো তার অশুভ থাবা গ্রাস করেছে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বনটুকুও। অবশ্য কালক্রমে এই শক্তিপ্রয়োগ আর বাহুবলে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বুদ্ধির কর্ষণ আর সভ্যতার ক্রমোত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শক্তিপ্রয়োগের পদ্ধতি হয়েছে ভিন্ন থেকে ভিন্নতর, হয়েছে জটিল থেকে জটিলতর।

আদিম সামন্তসমাজ থেকে বুর্জোয়া সামাজে রূপান্তর এবং বর্তমান বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা—যা সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের ধারায় অগ্রসরমান—সেখানেও পরম্পরাগতভাবে শক্তিপ্রয়োগের অনিবার্য তাগিদ লক্ষণীয়। স্বাভাবিক সামাজিক সংঘাতের বাইরেও যে পেশীশক্তির প্রয়োগ—এই বিবর্তনের ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা বিশাল। প্রশ্ন উঠতে পারে, শক্তিসাধনা কিংবা শক্তিপ্রয়োগ কি এক কথা ? হিন্দু ধর্মের দেবদেবী কিংবা অসুরদের সঙ্গে স্বর্গে-মর্তে যে-যুদ্ধ, সেখানে শক্তিপ্রয়োগের পূর্বে শক্তিসাধনা তো একটি স্বাভাবিক ধর্মীয় সংস্কারেরই অন্তর্ভুক্ত। রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু ক'রে ধর্মীয় যে কোনো উপাখ্যানের মধ্যেই দেব-দেবী বা ঈশ্বরবন্দনার মধ্য দিয়ে মূলত শক্তিরই সাধনা করা হয়েছে। অতএব শক্তিসাধনা হচ্ছে মানুষের মৌলিক প্রবণতারই বহিঃপ্রকাশ। সাহিত্যেও এই সাধনা বহু প্রাচীন। মঙ্গল-

কাব্য থেকে শুরু করে বর্তমানকালের সাহিত্যের মধ্যেও এর প্রকাশ লক্ষ্য করতে কষ্ট হবে না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি-সাধনার ধরন বদলে গেছে—ঈশ্বরবন্দনার মধ্য দিয়ে শক্তির আবাহন বা প্রার্থনা এখন সরাসরি শক্তি প্রয়োগের প্রয়াসের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে শক্তি সাধনার যে ধারা, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সেখানে এক উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী নাম। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব এক অস্থির সময় ও সংক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পট-ভূমিতে। বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্তের সৌভাগ্যসূর্য যখন অস্তমিতপ্রায়, অপরদিকে রাহুগ্রাসমুক্ত নতুন আশায় উজ্জীবিত মুসলিম মধ্যবিত্তের হচ্ছে নবজাগরণ—নজরুল ইসলামের আবির্ভাব সেই নতুন প্রভাতে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপী হতাশার পটভূমিতে নবজাগ্রত বাঙালী মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ ছিলো নতুন স্বপ্নসম্ভাবনায় উদ্দীপিত। নজরুলের কবি-মানসের মূলশক্তি ও প্রেরণা নবজাগ্রত এই সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গেও সম্পর্কিত। বস্তুত নজরুলের শক্তিসাধনার চারিত্র-বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নবজাগরণের ঢেউ এবং মুসলিম-মানসের উজ্জীবনকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করা দরকার।

বাংলা সাহিত্যে যে সময়ে নজরুলের আবির্ভাব, সে-সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল সূর্যের মতো দেদীপ্যমান। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এমন সব ব্যক্তিত্ব ভারতীয় সমাজবদলের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, যাঁরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এক পর্বতপ্রমাণ শক্তির আধার। বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার আন্দোলন বিকাশ লাভ করেছে এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক ধারা। অতএব নজরুলের কবি-চেতনায় এই সামাজিক প্রভাব যে এক গভীর ও ব্যাপক ছায়া ফেলতে সক্ষম হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

প্রত্যাশাদীপ্ত রোমান্টিক সৃষ্টিশীল হৃদয় সততই কামনা করে একটি সুন্দর-সুষম সমাজ। অথচ বহির্বাস্তবলোকে যা রয়েছে, তার মধ্যে কল্পজগতের এক বিপরীত চিত্র বর্তমান—ক্ষুধাদীর্ণ, ভীতিদুর্বল, নৈরাশ্যপীড়িত, নির্বাপিত স্বপ্ন, নির্বাসিত পৌরুষ, উপনিবেশকবলিত দেশের অস্থিচর্মসার এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী। তাই আশাবাদী স্রষ্টা-চৈতন্য নিজের আন্তররাজ্যে অনুসন্ধান করেন তাঁর আকাঙ্ক্ষার বাস্ত-

বায়ন। সুন্দর-সুষম সমাজপ্রত্যাশী কবি নজরুল তাঁর এই আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্যেই তাঁর কবিতায় শক্তিকে আবাহন করেছেন। যদিও নজরুল শক্তির উৎস খুঁজেছেন সাহসী আর পৌরুষদীপ্ততায় ভাস্বর কোনো না কোনো ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যিক বা পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে; তবু সতত জনজীবন-সংলগ্ন নজরুলের পুঞ্জীভূত আয়োজন ও মূল উদ্দেশ্য ছিলো সমাজের গুণগত পরিবর্তন সাধন। এ-কারণেই তিনি ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং পুরাণ মন্থন করেছেন সচেতনভাবে। উদ্দেশ্য, সত্য-সুন্দর-কল্যাণের প্রতিষ্ঠা এবং পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির জন্যে জনচিত্তকে জাগ্রত করা। তাই কখনো প্রলয়ংকর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন দেবাদিদেব শিব তাঁর আকাশাচ্ছাদিত পিঙ্গল জটা সঞ্চালনে—ধ্বংসের নেশায় উন্মাদ কিংবা সৃষ্টির উৎস হয়ে। এসেছেন অশিবনাশিনী ভয়ঙ্কর দেবী দশপ্রহরণ হাতে—চণ্ডীরূপিণী কিংবা শারদীয় মাতৃমূর্তি নিয়ে—রণরঙ্গিনী সঙ্গিনী কিংবা জলধিসূতা, সুরসেনাপতি ইত্যাদি সমভিব্যহারে। বিষ্ণুবক্ষ পদলাঞ্ছিত করে এসে উপস্থিত হয়েছেন সত্য-সন্ধানী ভৃগু, বিশালাকৃতির হলবাহী বলরাম, ক্রোধক্ষিপ্ত দুর্বাসা, মাতৃ-রক্তসিক্ত কঠোর কুঠারধারী পরশুরাম। ভারতীয় ঐতিহ্যের মতো পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের উৎস থেকেও নজরুল শক্তি সঞ্চয় করেছেন। 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় তিনি ইসলামের অভ্যুদয়-যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী থেকে শক্তি সংগ্রহ করেছেন। 'কোরবানী' কবিতায় যুবসমাজকে হযরত ইব্রাহিমের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদ্রোহী হতে ডাক দিয়েছেন, 'মোহররম' কবিতায়ও আছে আত্মত্যাগের মহিমা বন্দনাগীত। 'কামাল পাশা' এবং 'আনোয়ার' কবিতায়ও কবির এই শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'জিঞ্জির' (১৯২৮) কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়ও রয়েছে পশ্চিম এশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক বা সেনানায়কদের শৌর্যবীর্যের ঐতিহ্যাশ্রয়ে বর্তমানকে অনুপ্রাণিত করে তোলার অখণ্ড প্রয়াস। পৌরাণিক অর্জুন, ইতিহাসের খালেদ ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয়—এই উভয় ঐতিহ্যের পৌরুষের প্রতীক রূপে তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে বার বার।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় এবং পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সম্ভূত যে চরিত্রসমূহ নজরুলের কবিতায় শক্তির প্রতীক হয়ে এসেছে,

তারা নজরুলের বিশ্বাসের সঙ্গে কতোটুকু সম্পর্কিত? অর্থাৎ নজরুলের এই শক্তিসাধনার স্বরূপ কী? ক্রোচের মতানুযায়ী 'মানুষের চেতনা সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে না, সমাজই মানুষের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে ---এ-কথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে নজরুলের চরিত্র-সমূহের মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের কোন্ অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন—স্বভাবতই এ প্রশ্ন এসে যাবে। আসলে নজরুল-নির্মিত শক্তির প্রতীকসমূহ সমাজের কোন্ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে? কার্ল মার্কস স্পষ্টত মানুষকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ধনী এবং নির্ধন। ধনী যারা, তারা শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি; আর যারা নির্ধন, তারা সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত। নজরুল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বহারাশ্রেণীর প্রতিনিধিদের পক্ষে কথা বলেছেন। তাঁর শক্তির আধার এই সব সর্বহারা সাধারণ মানুষ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নজরুলের ভূমিকা কমিউনিস্টদের মতো নয়, যারা ... Openly declare their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the rulling class tremble of a communists revolution. The Proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, unite?

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগের পদ্ধতিটা তিন্নতর হলেও শোষক-শ্রেণীর মূলোৎপাটনে নজরুলের শক্তিপ্রয়োগের ইচ্ছেটাকে অনান্তরিক বলা চলে না। নজরুল জানতেন, যে মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ কবিকে মানুষের প্রতি ভালোবাসায় উজ্জীবিত করে, শুধু শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন ভালোবাসাই তাকে ইপ্সিত লক্ষ্যে পেঁীছে দিতে পারে না। সে জন্যেই তাকে মানবিক ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় শোষকশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা, যে ঘৃণা শক্তিসঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম। সন্দেহ নেই, নজরুলের কাব্যচেতনার মৌল প্রবণতা ছিলো মানবতাবাদের বিজয়কেতন উড়াবার সংকল্পে সুদৃঢ়। কিন্তু এই মানবতা শুধুমাত্র বুর্জোয়া উদার মানবতাবাদের প্রশ্রয়ে ব্যাপ্তি লাভ করেনি। যদিও সাম্যবাদী কবি হিসেবে নজরুলের যে ব্যাপক পরিচয়, প্রত্যক্ষভাবে মার্কসীয় সাম্যবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক না থাকলেও সমাজের মধ্যেকার শ্রেণীব্যবধান তাঁর মনের অগোচর ছিলো না।

সে ক্ষেত্রে তিনি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে স্পষ্ট ভেদরেখা নির্মাণ করে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারাশ্রেণীর সপক্ষে সাহসী পংক্তিমালা উচ্চারণ না করলেও তাকে কোনো অবস্থাতেই মার্কসীয় সাম্যবাদী ধারণার প্রতিকূল বলা যাবে না। বস্তুত 'গাহি সাম্যের গান' কবিতার মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু, তাকে অনেক সমালোচক মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যবাদী কবিতা বলতে দ্বিধাবোধ করলেও কাজী আবদুল ওদুদ স্পষ্টত বলেছেন, 'এই অপূর্ব আত্মবোধ কবিকে দুর্দমনীয় বেগে আকর্ষণ করল সাম্যবাদের দিকে। তখন থেকেই তিনি হলেন সাম্যবাদের কবি ও প্রচারক'।

কিন্তু এক্ষেত্রে নজরুলের সাম্যবাদী ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের পেছনে —'কিন্তু এ বিষয়েও যেন আমাদের ভুল না হয় যে, তাঁর সাম্যবাদের গুরু মার্কস নন, বরং ভারতীয় সুফী, ঋষি অথবা উভয়েই।'—এ ধারণাও অনেকাংশে দায়ী। মার্কসীয় সাম্যবাদ যদি নজরুলের প্রেরণার বিষয় না-ও হয়ে থাকে, সে-ক্ষেত্রেও কি এটা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় সুফীতত্ত্ব কিংবা ঋষিবাদ তাঁর অনুপ্রেরণার বিষয়? বরং এই দুই তত্ত্বের সমতার ধারণার সঙ্গে যে আধ্যাত্মিকতার আবেশ যুক্ত, নজরুলের কবিতায় শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের বিদ্রোহী ভূমিকার কোথাও তার আভাস মাত্রনেই।

তবে কি এই ধারণার প্রধান কারণ, নজরুল তাঁর কবিতায় যে শক্তি সাধনা করেছেন, যেখানে তিনি প্রাচীন ভারতীয় কিংবা পশ্চিম এশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য বা পুরাণের শরণাপন্ন হয়েছেন? তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাতে যে উপমা, উৎপ্রেক্ষা কিংবা রূপকের আশ্রয় তিনি নিয়েছেন, সেখানে দেব-দেবী কিংবা মুসলিম ঐতিহ্যসমন্বিত বিভিন্ন চরিত্র উঠে এসেছে? কিন্তু এই সব চরিত্রতো বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, এরা শৌর্যবীর্যের প্রতীকমাত্র এবং কবিও এই সব চরিত্রকে শোষিত শ্রেণীর সপক্ষে শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শোষিত কিংবা শোষকের শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন মাত্র।

বস্তুত যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন. নজরুলের শক্তিসাধনা আসলে তাঁর সাম্যবাদী চেতনারই স্বতন্ত্র ও সংহত বহিঃপ্রকাশ। এই শক্তির প্রকাশ এক একজনের দৃষ্টিতে এক এক রকম মনে হতে

পারে, কিন্তু তাতে ক'রে নজরুলের মৌলিক অনুপ্রেরণায় যে মানবিক আবেদন, তাকে আধ্যাত্মিকতার আবেশে আচ্ছন্ন করা যাবে না। এ সম্পর্কে সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'শক্তির সাধনা করতে চেয়ে মাঝে মাঝে আপাত স্ববিরোধিতারও তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন। পুনর্জাগ্রত ইসলামের শক্তিমন্ত রূপের কল্পনা করেছেন কখনো কখনো ; এবং শেষ বয়সে আধ্যাত্মিক শক্তিরও সাধনা করেছেন। কখনো চরকার গান গেয়েছেন. আবার পর মুহূর্তেই হয়ত বিপ্লবীদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। কিন্তু সকল অবস্থাতেই ভীরুতার দৈন্যপীড়িত ও হীনমন্যতার বিকারে আড়ষ্ট দেশে শক্তির উদ্বোধন কামনা করেছেন।'

এই শক্তির উদ্বোধন কিংবা শক্তির সাধনা কি সুফীতত্ত্ব বা ঋষিবাদের সপক্ষে নজরুলের সমর্থন প্রমাণ করে? এ থেকে কি বলা চলে যে, নজরুলের কাব্যসাধনা অধ্যাত্মবাদের যূপকাষ্ঠে তাঁর বিদ্রোহী সত্তাকে নতমস্তক করেছে? যদি তাই হবে, তা হলে তিনি কেন গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলন ছেড়ে সহিংস সন্ত্রাসবাদের সমর্থক হয়ে উঠবেন? নজরুল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' উৎসর্গ করেছিলেন সন্ত্রাসবাদী নেতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উদ্দেশে। উৎসর্গ পত্রে তিনি লেখেন :

অগ্নিঋষি ! অগ্নিবীণা তোমায় শুধু সাজে ;
তাই ত তোমার বহ্নি–রাগেও বেদন–বেহাগ বাজে।
দহন–বনের গহনচারী—
হায় ঋষি কোন্ বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি
অগ্নি-মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন্ বাঁশী সে বুঝতে পারি না যে।
(অগ্নিবীণা / উৎসর্গ পত্র)

অবশ্য এটা ঠিক, নজরুল ইসলাম শুধুমাত্র ধ্বংসের জন্যেই শক্তির সাধনা করেন নি। বস্তুত তাঁর শক্তিসাধনা ছিলো সৃষ্টিশীল। সৃষ্টিশীল ঐতিহ্যচেতনা দিয়ে তিনি পৌরাণিক চরিত্রসমূহের নবমূল্যায়ন করেছেন। ইতিহাস ও পুরাণের স্মৃতিতে তিনি সংরক্ত সমকালের সংবেদনা ও সংক্ষোভ ছড়িয়ে দিয়েছেন ; পুরাণের মধ্যেই তাঁর সৃষ্টিচঞ্চল মানসাকাঙ্ক্ষাকে অভিব্যক্ত করেছেন। তাই তিনি এমন চরিত্রের শরণাপন্ন

হয়েছেন, যেখানে আছে একই সঙ্গে ধ্বংস ও সৃষ্টির যুগল প্রস্ত্র-উৎস। তাঁকে অনুপ্রাণিত করে নটরাজ শিব, চণ্ডীরূপিনী দুর্গা, বীর কামাল পাশা, চেঙ্গিস প্রভৃতি চরিত্র। তাই নজরুল-কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়-গুলো পিক কুহরিত কুঞ্জবন নয়, ঝঞ্ঝা-উন্মত্ত সৈনিকের পদভার-প্রকম্পিত সুকঠিন যুদ্ধের ময়দান। বস্তুত স্বীয় শক্তিপূজারী মানসকে নজরুল তাঁর কবিতার বিভিন্ন পর্যায়ে পরিস্ফুট করেছেন বিভিন্ন শক্তিধর বিষয়ের মধ্য দিয়ে। এই বিষয়গুলোকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

ক. প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে—হিমাদ্রি শেখর, মহাপ্রলয়, কালবৈশাখী, সাইক্লোন, ধূমকেতু, তরঙ্গক্ষুব্ধ সাগর ইত্যাদি।

খ. দৈবশক্তির উদাহরণে—রুদ্র, ভগবান, দুর্বাসা, ভৃগু, ধূর্জটি, নটরাজ, পরশুরাম, চণ্ডী, সুরসৈনিক, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি।

গ. মানবীয় ক্ষমতার স্মরণে—বেদুঈন, চেঙ্গিস, গজনী মামুদ, কালা-পাহাড়, কামাল পাশা, আনোয়ার, হাসান, হোসেন ইত্যাদি।

ঘ. শক্তিধর প্রাণের আশ্রয়ে—বোররাক, উচ্চৈঃশ্রবা, বাসুকীর ফণা ইত্যাদি।

ঙ. বস্তু ও স্থান উল্লেখের মাধ্যমে—খড়্গ, কৃপণ, দধিচীর অস্থি, পরশুরামের কুঠার, বলরামের হল, দু'ধারী জুলফিকার, হাবিয়া দোজখ, জাহান্নাম ইত্যাদি।

এ ছাড়াও নজরুলের কবিতায় শক্তিমত্তার প্রতি আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ধরা পড়েছে ত্রৈমাত্রিক ভঙ্গীতে। যেমন—

ক. উপাখ্যান ও পৌরাণিক অনুষঙ্গে—প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বর-ধারিণী মা, আগমনী, ধূমকেতু, শাত-ইল-আরব, খেয়াপারের তরণী, কোরবানী, মোহররম, রণভেরী প্রভৃতি কবিতায়।

খ. ব্যক্তিত্ব আশ্রয়ী হয়ে—কামাল পাশা, আনোয়ার, হেমপ্রভা, মিশর-নেতা জগলুল পাশা, রীফনেতা গাজী আবদুল করিম, ইসলাম গৌরব যুগের খালেদ, তারিক, মুসা, কিংবা ওমর, চিত্তরঞ্জন, প্রভৃতি।

গ. মানবতাবাদের পথ ধরে—সাম্যবাদী, সর্বহারা, ভাঙার গান, ফণিমনসা, জিঞ্জির, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু প্রভৃতি।

ঐতিহ্যসচেতন নজরুল লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর অস্ত্ররূপী শব্দের আঘাতে অত্যাচারীর সাজানো সৌধ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। শব্দাস্ত্ররূপ 'নিখুঁত ত্রিশূল' ছিলো তাঁর হাতের মুঠোয় বন্দী। কারাবাস, গ্রন্থাবলীর বাজেয়াপ্তকরণ তাঁর কবিতার অসামান্য শক্তিরই প্রমাণ বহন করে। বস্তুত নজরুলের কবিতার শব্দ যেমন তাঁর শক্তিমত্তার আধার, তেমনি তাঁর অন্তর্গত প্রাণাবেগের মধ্যেও সেই শক্তিরই প্রবাহ। নজরুলের হৃদয়গত উপলব্ধিতে পুরনো প্রচলিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে যে আকাঙ্ক্ষা, তাকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করার জন্যেই তিনি তাঁর কবিতার শব্দে যেমন, তেমনি উপমা, উৎপেক্ষা, রূপক এমনকি ছন্দ ব্যবহারেও যে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন করেছেন, সেখানেও তাঁর শক্তি-সাধনার প্রয়াস লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রে তিনি ভালোমন্দের বিবেচনা ছাড়াই শক্তি ও শৌর্যবীর্যের প্রতীক যে কোনো চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিলো পৌরাণিক কাহিনী বা চরিত্র। অবশ্য 'পুরাণের ব্যবহার নজরুলের কাব্যে পৌরাণিক কাহিনী হিসেবে নয়—আধুনিক কবির ভাবের বাহন ও প্রতীক হিসেবেই তার সার্থকতা। কাহিনীগুলো এখানে তাদের মূল ধর্মগত গণ্ডী থেকে মুক্তি পেয়ে এক সার্বজনীন রূপ, একটা সাধারণ ভাব প্রকাশের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত'।

কিন্তু নজরুল তাঁর কবিতায় যে শক্তিসাধনা করেছেন, সেখানে তিনি সমকালীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কি কোনো শক্তি-উৎস খুঁজে পাননি? সেজন্যেই কি তিনি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পুরাণ মন্থন করে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়াস পেয়েছেন? নজরুলের কাব্যবিশ্লেষণে এ কথা বলা যাবে না যে, সমকালীন জীবন ও সময়ের প্রতি তাঁর কোনো অবজ্ঞা ছিলো। বরং তাঁর কাব্যের প্রধানতম অবলম্বন হচ্ছে সমসাময়িক সমাজ ও জীবন। তবু মনে রাখতে হবে, 'ভীরুতা ছিল যে সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেখানে তিনি শক্তিসাধনা করেছিলেন। স্বার্থচেতনা ছিল যে মানসিকতার প্রধান লক্ষণ তাকে তিনি বৃহতের মধ্যে নিজেকে

ব্যাপ্ত করার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছিলেন। কৃষ্টি যেখানে বৈশিষ্ট্য-হীন গতানুগতিকতায় নিজের সার্থকতা খুঁজত, সেখানে স্পর্ধিত ব্যক্তিত্বের দুর্জয় ঘোষণা তিনি জানিয়েছিলেন। উপকথার কদাকার দৈত্যের মত অত্যাচারী ক্ষমতার যে বোঝা উপমহাদেশের নিরীহ প্রাণকে অতিষ্ট করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠকে তিনি স্বরগ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন'।

অবশ্য এ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা চলে না যে, ভারতীয় জনগণের শৌর্যবীর্যের প্রতি তাঁর মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিকূল ছিলো। বরং ভারতীয় সমাজে নানাভাবে যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হচ্ছিলো, তাতে নতুন মাত্রা সংযোজনের কৃতিত্ব নজরুলের। জনগণের প্রতি তাঁর আস্থার অভাব ছিলো না। বিশেষত তরুণ সমাজের প্রতি তাঁর আস্থা ছিলো প্রবল। তাই ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনসহ সব ধরনের আন্দোলনে তিনি তারুণ্যের শক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বিশেষত ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা তাঁকে সব-চেয়ে বেশি ব্যথিত করে। আবার 'প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পাক-ভারত উপমহাদেশে একদিকে সাম্যবাদী চিন্তা অন্যদিকে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মঞ্চে হিন্দু-মুসলমানের সাময়িক সম্প্রীতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই উভয় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কবি, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তাঁর লেখনী চালনা করেন'। এবং এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাঁর কবিতায় হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যসমন্বিত প্রতীকের ব্যবহার এবং সেখান থেকে শক্তিসঞ্চয় বস্তুত এই দুই সম্প্রদায়ের শক্তিকে সব ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কাজে ব্যবহারের আকুতিরই প্রয়াস থেকে উদ্ভূত। বাংলা কাব্যে নজরুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অসাম্প্রদায়িক চেতনা। 'নজরুল হিন্দু-মুসলমান উভয় ঐতিহ্য থেকেই কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেছেন আর সে কারণেই তিনি একমাত্র মুসলমান সাহিত্যিক যাঁর সাহিত্য কর্ম উভয় সমাজেই আদৃত হয়েছে'।

অস্থিমজ্জায় ঘুণে-ধরা এই দেশবাসীর শৃঙ্খলমুক্তির জন্যে হিন্দু-মুসলমান একাত্মতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে ছুঁৎমার্গের দোহাই দিয়ে একে অপরকে দূরে সরিয়ে রাখার 'জাতের নামে বজ্জাতি'-র বিরুদ্ধে

তিনি ক্ষোপ প্রকাশ করেছেন। তিনি চাননি, এভাবে মিথ্যে ছুঁৎমার্গের প্রভাবে শক্তি'র অপচয় হোক। সে-জন্যেই তাঁর শক্তিসাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিলো উভয় সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্যভিত্তিক চরিত্র ও প্রতীকের ব্যবহার, যাতে তাঁরা এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের মধ্যেকার বিভেদ ভুলে যান। এ ক্ষেত্রে নজরুল বহু ধর্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত এ দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে দ্বিধাহীন চিত্তে কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট ও মোহাম্মদকে তাঁর কবিতার সিংহাসনে বসিয়েছেন। 'সবচেয়ে বড় কথা ধর্মীয় ঐতিহ্য তাঁর কাব্যে বিপ্লবী তাৎপর্য লাভ করেছে! পুঁথি রচয়িতাদের অন্ধ বিশ্বাস ও অলস ভক্তি-প্রবণতাকে অতিক্রম করে হিন্দু-মুসলিমের ঐতিহ্যে তিনি আধুনিক সমাজসচেতনতা আরোপ করে সত্যকার বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে হযরত মোহাম্মদ বিদ্রোহী সাম্যবাদী, খালেদ বিশ্বের মজলুম মানুষের সেনাপতি, খলিফা ওমর সাম্য, সুবিচার ও মানবতার প্রতীক, শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী কংসকক্ষে কংসহন্তা, সব্যসাচী দুঃসাহসী যৌবনধর্মের প্রতীক'।

বস্তুত বিদ্রোহের প্রয়োজনে. হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনে এবং এই বিদ্রোহ কিংবা ঐক্যকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্যে নজরুল শক্তির সাধনা করেছেন। শক্তির জন্যে তাঁর সাধনা তাঁকে 'অস্থির প্রবহমান জীবনীশক্তি'র চঞ্চল 'কবি'তে পরিণত করেছে। তাঁর সমস্ত জীবন-প্রণালীতে উচ্চারিত, উচ্চকিত এই শক্তিসাধনা কাব্যকে গতিবান করেছে ..... অর্থাৎ কবিতার সাথে শক্তিসাধনার মিল ঘটেছে।'

সমাজের মুক্তি'র জন্যে, সত্য-সুন্দর-কাল্যাণের সপক্ষে বিদ্রোহের প্রয়োজনে ঐই শক্তিসন্ধানের সাধনা বাংলা কবিতায় নজরুলকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. রফিকুল ইসলাম: কাজী নজরুল ইসলাম: জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮২

২. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ: নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, ওসমানিয়া বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৬৩; পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

৩. আতাউর রহমান : নজরুল কাব্যসমীক্ষা, মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১

৪. কাজী মোতাহার হোসেন : নজরুল কাব্য-পরিচিতি, জুয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৯

৫. মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ : নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত : নজরুল সমীক্ষণ, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭২

৭. মীর আবুল হোসেন সম্পাদিত : নজরুল সাহিত্য ১৯৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৫

৮. কাজী আবদুল ওদুদ : নজরুল প্রতিভা, বর্মণ পাবলিশিং হাউজ, কলিকাতা, ১৯৪৯

৯. Karl marks, এবং Fredaric Engles ; Communist Manifesto, Progress Publishers, Moscow.